

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের
নির্বাচিত পোস্টে সমগ্র

২০১৬ ইসহাযী



তায়কিয়াতুন নাফস আর্কাইভ-২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ইসায়ী

সূচিপত্র

কত কঠিন আমাদের হৃদয় !!!.....	৪
বিয়ের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া চাই।	৯
যবানের হেফাজত সফলতার সোপান :.....	১৩
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা (Self_Reminder)	২৯
একটি শিক্ষণীয় বাসরগল্প :	৩৩
দৃষ্টি সংযত করার ২০ টি উপায়.....	৩৬

কত কঠিন আমাদের হৃদয় !!!

Musab Umar

Junior Member

০২-২৯-২০১৬

আল্লাহ ভীতি সম্পর্কিত একটি ভাষণ :

একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনতাকে সম্বোধন করে বলেন, “ হে মানুষ, যা আমি জানি, তোমরা তা জানলে, খুব কমই হাসতে এবং অনেক বেশি কাঁদতে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহকে ভয় করো। (জামি‘ সাগীর, পৃষ্ঠা ৫৮০)

ব্যাখ্যা : সকল প্রকার হীন আচরণ, ফিতনা-ফাসাদ ও কুকর্ম থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহভীতি একটি মোক্ষম প্রতিষেধক, এটা যাবতীয় পুণ্যকর্ম ও সদিচ্ছার উদ্দীপক এবং জান্নাত লাভের কারণ ও মাধ্যম। আল্লাহ তা’আলা বলেন, -“ যে আপন প্রতিপালকের সামনে হাযির হওয়ার ভয় রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।” (৭৯: ৪০-৪১)

যেহেতু আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহ ভীতির উপর নির্ভরশীল, তাই এখানে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে । রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “ আল্লাহ ভীতি হচ্ছে হিকমত ও বিজ্ঞতার মূল।”

(কানযুল উম্মাল , পৃষ্ঠা ২৭২)

তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদবে, তার জাহান্নামে যাওয়াটা সেরূপ, যেরূপ বেরিয়ে আসা দুধের স্তনে ফিরে যাওয়াটা (তিরমিযী)।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ থেকে একটুখানি অশ্রু বরবে, সে চোখের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। (তিবরানী, কানযুল উম্মাল ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭১)

তিনি আরো বলেন, যখন মুসলমানের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়, তখন তা থেকে পাপরাশি এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেমন ঝরে পড়ে গাছপালা থেকে শুকনো পাতা। (মুসনাদে আহমাদ: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২)

জনৈক সাহাবীর এক প্রশ্নের উত্তরে একদা রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নাজাতের পথ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, ঘরে বসে থাকো এবং আপন ভুল-ত্রুটির উপর কাঁদতে থাকো। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আয়েশা (রা) একদা রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি কি থাকবে, যে হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে? রসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি, যে তার গুণাহসমূহ স্মরণ করে কাঁদে। (জামি' সাগীর : আল্লামা সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ৪৪৫)

হযুর (সা) বলেন, যাবতীয় ফোটার মধ্যে মাত্র দু'টি ফোটাই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয়। একটি হলো সেই অশ্রুর ফোটা, যা আল্লাহর ভয়ে চোখ থেকে ঝরে পড়েছে এবং অপরটি হলো সেই রক্তের ফোটা, যা আল্লাহর পথে দেহ থেকে প্রবাহিত হয়েছে। (জামি'তিরমিযী : ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭২)

বুখারী শরীফে আছে, কিয়ামতের দিন সাতজন লোক আল্লাহর করুণা ও সহানুভূতির ছায়ায় আশ্রয় পাবে। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। এ ধরনের বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

এবার শুনুন, অনুরূপ পরিস্থিতিতে হুজুরে আকরাম (সা) সাহাবা-ই কিরাম (রা) ও অলী-আউলিয়াদের কি অবস্থা হত।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বৃষ্টিবাদলা, ঘনঘটা ও ঝড়-তুফানের সময় রসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা এক ভীতিকর অবস্থা ফুটে উঠত। তিনি কখনো ঘরের বাইরে যেতেন, আবার কখনো ভিতরে আসতেন। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল, মানুষ তো পানি(মেঘ) দেখে খুশি হয়, কিন্তু আপনাকে ভয়ানক দেখা যাচ্ছে? হুজুর (সা) উত্তরে বলেন, আমার ভয় হচ্ছে, না জানি মেঘের মধ্যে সেই আযাবই লুকিয়ে রয়েছে, যা 'আদ জাতির উপর আপতিত হয়েছিল। তারা তো

মেঘ দেখে সেটাকে পানিই মনে করেছিল, অথচ তাতে লুকিয়ে রয়েছিল আল্লাহর আযাব। (আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭১)

হযরত আনাস (রা)-এর জীবিতাবস্থায় একদা আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, রসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগেও কি এরূপ অবস্থা কখনো হয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহর পানাহ! হযূর (সা)-এর যুগে বায়ু একটু প্রবল বেগে বইতে থাকলে আমরা কিয়ামত আগমনের আশঙ্কা করতাম এবং মসজিদ অভিমুখে দৌড়ে যেতাম। (তাবাকাত)

হযূর (সা) সম্পর্কে এই মর্মে অনেকগুলো রিওয়ায়েত আছে যে, তিনি সারা রাত কাঁদতে থাকতেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা তাঁর (সা) এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার শুয়ে পড়তেন। অতঃপর উঠে পুনরায় নামায পড়তেন এবং নামাযের মধ্যে এমনভাবে কাঁদতেন যে, মনে হত, চুলার উপর হাড়িতে কিছু রান্না হচ্ছে। (সুনানে কুবরা, পৃষ্ঠা ৩৯)

(সাহাবীদের অবস্থা : হযরত আবু বকর (রা) যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তিনি জান্নাতীদের নেতা এবং আমার উম্মতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবেন' (সেই আবু বকর) প্রায়ই বলতেন, হায়! আমি যদি সেই বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলা হত কিংবা সেই ঘাস হতাম, যা জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ফেলত। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ৯৯)

হযরত উমর ফারুক (রা), যার সম্পর্কে হযূর (সা) বলেন, 'যদি আমার পরে কোন নবী হত, তাহলে তিনি হতেন এই উমর', তিনি (সা) আরো বলেন, 'জান্নাতে উমর আমার সাথী হবে,' হে আল্লাহ, উমরের মুখ দিয়ে হুক জারী কর- সেই (উমর) প্রায়ই বলতেন, হায়! আমি যদি তুচ্ছ খড়্গকুটা হতাম এবং হিসাব নিকাশের কোন ভয় আমার না থাকত! তিনি কখনো কখনো এও বলতেন, হায়, আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা ৫৪৪)

হযরত উসমান গনি (রা) সম্পর্কে হযূর (সা) বলেন, 'হায়া (লজ্জা) ও ঈমানের ক্ষেত্রে উসমান একজন পরিপূর্ণ মানুষ', 'উসমান জান্নাতী', উসমান যাই করুক, আল্লাহ তার অগ্রপশ্চাৎ সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

একদা উসমান(রা) কোন একটি ভুলের কারণে তার একটি কৃতদাসের কান মলে দিলে সে বলে উঠে, ‘মনে হচ্ছে, আপনি আল্লাহকে ভয় করেন না।’ একথা শুনামাত্র উসমান(রা) কাঁপতে থাকেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি পাননি, যতক্ষণ না ঐ কৃতদাসের হাত দিয়ে নিজের কানটি মলিয়ে নেন। হযরত উসমান (রা) কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত রাত কাটিয়ে দিতেন এবং রাতের নামাযের মধ্যেই সমগ্র কুরআন শরীফ একবার খতম করতেন। (তারীখ-ই-ইসলাম :কামিল)

আর হযরত আলী (রা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ‘আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু’, ‘হে আল্লাহ, তুমি তাকে বন্ধু জ্ঞান কর, যে আলীকে বন্ধু জ্ঞান করে এবং তাকে শত্রু জ্ঞান কর, যে আলীকে শত্রু জ্ঞান করে।’ তিনি (সা) আরো বলেন, ‘আলী আমার এবং আমি আলীর। (মুসনাদে আহমাদ)

অথচ হযরত উসমান ও আলী (রা)-এর অবস্থা ছিল এই যে, আজানের আওয়ায শুনলে ভয়ে তাদের চেহারার রং বদলে যেত। তারা বলতেন, এটা যে মহান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে অধম বান্দার হাযিরা দেওয়ার সময়। (তারিখে খামীস, পৃষ্ঠা ৩১১)

তারা আল্লাহর ভয়ে সারা রাতকাঁদতে থাকতেন, এমনকি তাদের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে জবজবে হয়ে উঠত। (যাদুল মা‘আদ: ইবনে কাইয়িম, পৃষ্ঠা ৭১১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), যিনি রসূলুল্লাহ (সা)- এর একজন অতি প্রিয় চাচাতো ভাই ছিলেন এবং খোদ রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে ‘এই উম্মতের বিরাট আলিম’ উপাধি পেয়েছিলেন- একদা তার চোখে রোগ দেখা দেয়। তখন চিকিৎসক বলেন, এই রোগের ততক্ষণ পর্যন্ত কোন চিকিৎসা হবে না, যতক্ষণ না তিনি (ইবনে আব্বাস) কান্না বন্ধ করেন। তখন তিনি বলে উঠেন, আল্লাহর ভয়ে যে চোখ থেকে অশ্রু নির্গত না হয়, সে চোখ চোখই নয়। শেষ পর্যন্ত তিনি অন্ধ হওয়াটাকেই শ্রেয় মনে করেন, কিন্তু রাতের বেলা আল্লাহর স্মরণে ও আল্লাহর ভয়ে কান্না বন্ধ করেননি। (তাবাকাতে ইবনে সা‘দ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা), যিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন, আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে যান। একদা লোকে তাঁকে এত বেশি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমরা আমার কান্না দেখে বিস্মিত হও, অথচ আল্লাহর ভয়ে সূর্যও কাঁদে। (ইসাবা: ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১১)

হযরত ইমাম আ‘যম (রহ) একদা সারা রাত এই আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকেন-

“হে অপরাধীগণ, তোমরা আজ কিয়ামতের দিন পৃথক হয়ে যাও।” (৩৬:৫৯)
তাঁর এ চিরাচরিত অভ্যাস ছিল যে, তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং অর্ধেক রাত আল্লাহর স্মরণে কান্নাকাটি করতেন। (মানাকিবে ইমাম আ‘যম : পৃ :৩৬৬)

মোটকথা, হুযূর আকরাম (সা), খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবা-ই-কিরাম (রা) এবং অলী-আল্লাহগণ এত মর্যাদাসম্পন্ন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে সব সময় কাঁপতে থাকতেন, তারা প্রতিটি মুহূর্তে পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকলেও আল্লাহর ভয়ে ছিলেন সদা কম্পমান। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ভীতির মধ্যে যে স্বাদ ও মজা রয়েছে, তা অন্য কোন জিনিসের মধ্যেই নেই। স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দার মধ্যে দু’টি ভয় এবং দু’টি দুশ্চিন্তা একত্রিত করবো না। যে আমাকে এখানে ভয় করতে থাকে, তাকে আমি আখিরাতের ভয় থেকে নাজাত দেব। আর যে এখানে আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে আমি আখিরাতে দুশ্চিন্তার সম্মুখীন করবো। (তিবরানী: ৭ম খণ্ড, পৃ ১৭১)

অতএব প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকা উন্নতি ও পরিপূর্ণতা লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এর তাওফীক দান করুন। আমীন !

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২০৫০>

বিয়ের উদ্দেশ্য কেমন হওয়া চাই।

ABU SALAMAH

Senior Member

০৪-২৪-২০১৬

নাজমুদ্দীন আইয়ুব (রহ.)। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর (রা.) পিতা। তার হাতে তিকরীতের শাসনভারের গুরুদায়িত্ব। কিন্তু বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে, তবুও বিয়ের নামগন্ধ নেই। এটা দেখে ভাই আসাদুদ্দীন শিরকূহ চিন্তিত হয়ে পড়লেন:

-কিরে বিয়ে থা করবে না?

-আমার মনমতো পাত্রী পাচ্ছি না তো।

-আমি পাত্রী দেখবো তোমার জন্যে?

-পাত্রীটা কে শুনি?

-মালিক শাহের মেয়ে অথবা নিযামুল মুলকের মেয়ে?

-নাহ, তারা আমার কাঙ্ক্ষিত পাত্রী নয়।

-তা তোমার কাঙ্ক্ষিত পাত্রীর বৈশিষ্ট্য কী বলো তো!

-আমি চাই একজন সুশীলা স্ত্রী, যে আমার হাত ধরে জন্মাতের দিকে নিয়ে যাবে। যে আমাকে একটি নেক সন্তান উপহার দিবে। সে-সন্তানকে যথাযথ লালন-পালন করে বড় করবে। বড় হয়ে সে ছেলে হবে একজন দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার, সাহসী মুজাহিদ। আরও বড় হয়ে যে মুসলমানদের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরিয়ে আনবে।

দুই:

দু'ভাইয়ে যখন কথা হচ্ছিল, তারা ছিলেন তিকরীতে, যেরুশালেম থেকে অনেক অনেক দূরে। বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল ক্রুশেডারদের হাতে। কিন্তু নাজমুদ্দীনের তনুমন পড়ে ছিল আল আকসার পানে। এমনকি নিজের বিয়েটা পর্যন্ত স্বপ্নের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

আসাদুদ্দীন ভাইয়ের কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না:

-তুমি যেমন কনের আশায় বসে আছ, ইহজীবনে পাবে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।

-যে ইখলাসের সাথে আল্লাহকে রাযি করার জন্যে কোনও নিয়্যাত করে, আল্লাহ তাকে তা দিয়ে দেন।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, নাজমুদ্দীন তিকরীতেরই এক শায়খের মজলিসে বসে আছেন। তার সাথে কথা বলছেন। এমন সময় এক যুবতী এসে পর্দার আড়াল থেকে শায়খকে সালাম দিল। শায়খ সালামের উত্তর দিয়ে বললেন:

-তোমার জন্যে যে পাত্রটা পাঠিয়েছিলাম, তাকে তোমরা ফিরিয়ে দিলে কেন? কে কম কিসে?

-শায়খ! আপনার পাঠানো পাত্র জ্ঞানে-গরিমায় কোনও অংশে ফেলনা নয়। রূপে-গুণে-পদে-অর্থো বাছার মতো নয়।

-তাহলে ফেরত দিলে কেন?

-শায়খ! এই পাত্রের মধ্যে আমার কাস্তিত বৈশিষ্ট্য নেই।

-তুমি কেমন পাত্র চাও?

- আমি চাই একজন নেককার পাত্র, যে আমার হাত ধরে জাহ্নামের দিকে নিয়ে যাবে। যে আমাকে একটি নেক সন্তান উপহার দিবে। সে সন্তানকে যথাযথ লালন-পালন করে বড় করবে। বড় হয়ে সে ছেলে হবে একজন দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার, সাহসী মুজাহিদ। আরও বড় হয়ে যে মুসলমানদের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরিয়ে আনবে। নাজমুদ্দীন অবাক হয়ে দুজনের কথোপকথন শুনছিলেন মেয়েটার শেষ কথা শুনে তিনি একেবারে বাক্যহারা হয়ে গেলেন। দুইজন অপরিচিত মানুষের কথা এমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় কী করে? তিনি ভাবনার অতলে হারিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়েই বলে উঠলেন:

-শায়খ! আমি এই পুণ্যবতী মানুষটাকে বিয়ে করতে চাই।

-নাহ, তা কী করে সম্ভব! এই মেয়ে আমাদের মহল্লার সবচেয়ে গরীব ঘরের সন্তান। তুমি হলে আমাদের ওয়ালী! গভর্নর!

নাজমুদ্দীন শায়খকে সব কথা খুলে বললেন। শায়খ সব শুনে অজান্তেই একটা আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

-তাঁর (আল্লাহর) অন্যতম একটা নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে, তোমাদের থেকেই স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো।

দুইজন মহৎপ্রাণ যুবক-যুবতীর বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ইখলাস ও নিয়্যাতের বরকতে তাদেরকে দান করলেন:

= গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে (রহ.)।

তিন:

আমাদের বিয়ের উদ্দেশ্য কী হয়?

আমরা কেন বিয়ে করি?

আমাদের সন্তান জন্মানের পেছনে কী নিয়্যাত থাকে?

আসুন না, আমাদের বিয়ে ও সন্তান জন্মদান আরেকজন সালাহুদ্দীনের জন্যে হোক! মসজিদে আকসা আজ কাঁদছে।

ইহুদিরা নিচ দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাযলুম মসজিদকে ধ্বসিয়ে ফেলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

কেউ কি আছেন?

আর আমি কি করি? সর্বোচ্চ দীনদার একটি পাত্রি তালাশ করি, যাতে দুনিয়াতে সুখে থাকতে পারি আর আখিরাতে কামিয়াব হতে পারি। কিন্তু ভালোর মধ্যেওতো একটা স্তর আছে। এটা ভালো ঠিক যেমন যেমন রূপা মূল্যবান, কিন্তু স্বর্ণ আরো মূল্যবান তার থেকেও মূল্যবান হীরা। আমার নিয়ত থাকে ঐ রূপা থেকেও নিম্নস্তরের! আল্লাহ আমাদের বড় বড় নিয়ত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এরকম সবজায়গায় সবকাজে আমার নিয়ত এমন ছোট!

কিন্তু আল্লাহপাক আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে প্রেরন করেছেন।

আর এটার কারন এই যে আমরা সংকাজে আদেশ এবং অসং কাজে নিষেধ করবো। তথা দ্বীনের সম্পূর্ণ জিন্মাদারি পালন করবো।

একঃ নিয়ত সর্বোচ্চ হওয়া চাই।

দুইঃ এর সাথে সর্বোচ্চ চেষ্টা। দ্বীনের মেহনতের জিন্মাদারী পৌছে দেয়া

তিনঃ দোয়া করা।

মহান রব্বুল কারীম ইব্রাহীম (আলাইহিসসালাম) এর দোয়ার বরকতে রসূল (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইব্রাহীম (আলাইহিসসালামের) এর বংশ থেকে প্রেরন করেছেন।

এখনতো আমরা নিয়ত করার হিন্মতই করতে পারিনা।

চেষ্টা আর দোয়াতো পরে হবে....ইয়া রব্ব আমাদেরকে বড় বড় নিয়ত, চেষ্টা এবং দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

আমিন...

হাতুড়ি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যেমন অপেক্ষমান থাকে আমাদের কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শুধু ওই বাজের ভিতরে অপেক্ষমান থাকলে চলবেনা বরং উদ্দেশ্যপূরণের সকল উপলক্ষ্য সঠিক ভাবে তৈরি করতে হবে।

সবচেয়ে বড় যেটা সেটা হলো পাহাড় পরিমান ইমানের হিন্মত নিয়ে দাড়াতে হবে.....

(collected & edited)

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৪৭৯>

যবানের হেফযত : সফলতার সোপান

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৮-২২-২০১৬

আল্লাহ মানুষকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন। মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষা দিয়েছেন। এ মানুষের প্রতি আল্লাহর এক মহা দান। পৃথিবীতে এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যারা এ নিআমত থেকে চিরবঞ্চিত। সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ এ নিআমত দান করেছেন তাদের উচিত এর যথাযথ ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হওয়া।

আল্লাহর এ নিআমতকে মানুষ তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে- এ শক্তি আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। এখন মানুষ তার এ শক্তিকে ভালো কাজে ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে; অথবা মন্দ কাজে ব্যয় করে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হতে পারে।

অমরা যাতে আল্লাহর দেয়া এ নিআমতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারি, যবানের অনিষ্ট থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি- এজন্য নবীজী আমাদের এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা দিয়েছেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

যে আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের অঙ্গ অর্থাৎ যবান এবং দুই পায়ের মাঝের অঙ্গের (সঠিক ব্যবহারের) যামানত দিবে আমি তার জন্য জাহ্নামের যামিন হব। - সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

যবানের নিয়ন্ত্রণ

উকবা ইবনে আমের রা. একবার নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাসূল! নাযাত কীসে? নবীজী উত্তরে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করলেন তা হল-

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ.

তুমি তোমার যবানের নিয়ন্ত্রণ কর। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪০৬)

ধ্বংস ডেকে আনে যবান

নবীজীর প্রিয় সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রা. বলেন, একবার নবীজীর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে নবীজীকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ.

আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।

(তখন নবীজী তাকে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন, এক পর্যায়ে বললেন,)

أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ لِبْسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَإِنَّا لَمُؤْخَذُونَ بِمَا نَنكَلُكُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلُّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

এ সবকিছুর মূল কী- আমি কি তোমাকে বলে দিব? আমি বললাম, জী, আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেন, এটাকে সংযত কর। এ কথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের কথাবার্তার জন্যও জিজ্ঞাসিত হব? নবীজী বললেন, আরো! যবানের কামাই-ই তো মানুষকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে! -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৯৭৩

হাঁ, যবানের অনিষ্ট এত ব্যাপক, তা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে ফেলো। বে-পরোয়াভাবে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই বলতে থাকে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্রে পরিণত হয়। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ،
وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ.

বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে, যদিকে সে খেয়ালই করে না, কিন্তু এর কারণে আল্লাহ তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। আবার বান্দা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মত কথা বলে, যদিকে সে ভ্রক্ষেপই করে না; কিন্তু তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৮

যা বলছি লিপিবদ্ধ হচ্ছে

আমাকে ভাবতে হবে- কী বলছি, কী বলা উচিত। কারণ, আমার গুরুত্বহীনভাবে বলা কথাও আমার কত বড় ক্ষতি সাধন করতে পারে- উপরের হাদীস থেকে জানতে পারলাম। তাছাড়া আমার সব কথা তো লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيْنَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.

স্মরণ রেখ, দুই গ্রহণকারী ফিরিশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত। -সূরা কফ (৫০) : ১৭-১৮

সালফ তাদের শীষ্য-সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সতর্ক করতেন। সুফিয়ান ছাওরী রাহ. একদিন তাঁর সঙ্গীদের বললেন-

لَوْ كَانَ مَعَكُمْ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَكُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، أَكُنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ بِشَيْءٍ؟

তোমাদের সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে, যে তোমাদের কথা সুলতানের কাছে পৌঁছে দিবে, তোমরা কি কোনো কথা বলবে?

সঙ্গীরা বললেন- لا জী না

তিনি তখন বললেন-

فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ.

তাহলে জেনে রেখ, তোমাদের সাথে এমন লোক আছেন যিনি কথা পৌঁছান।
অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৬৮

কথার তিক্ততা চিরতার চেয়েও তীব্র

চিরতার তিক্ততা সবাই জানে। যে চিরতা-পানি পান করেছে সেও জানে, যে পান করেনি সেও জানে। কিন্তু মানুষের কথার তিক্ততা চিরতা থেকেও তিক্ত। এক হাদীসে আয়েশা রা. নিজের কথা বর্ণনা করেন-

তিনি বলেন একবার আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে (উম্মুল মুমিনীন) সাফিয়্যা সম্বন্ধে বললাম, সাফিয়্যা তো এই এই। (তার মাঝে তো এই এই দোষ আছে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়্যা তো বেঁটে ইত্যাদি।) এ কথা শুনে নবীজী বললেন,

لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَّوْ مُزِجْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.

তুমি এমন (জঘন্য) কথা বলেছ, যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেয়া হয় তাহলে সাগরের পানি ঘোলা হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এমন তিক্ত ও নোংরা কথা তুমি বলেছ।) -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৫

কথার বর্শায় হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়

আমি যখন কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়া কথা বলব তো আমার যবান থেকে এমন কথা বের হয়ে যেতে পারে, যা কোনো ভাইয়ের হৃদয়কে জখম করবে। আমার কথার বর্শায় কারো হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হবে। কবি বলেন,

جراحات السنان لها التئام

ولا يلتام ما جرح اللسان

বর্ষার যথম শুকিয়ে যায়

কিন্তু যবানের যথম শুকায় না

আমার মুখের কথার দ্বারা কত মানুষের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। আমার কোনো খবরই নেই। আর যবানের যথম এত মারাত্মক, যার কোনো দাওয়াই নেই। নিচে যবানের দ্বারা ঘটে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, যা মানুষের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে।

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও মন্দ নামে ডাকা

এ বিষয়টিকে আমরা অনেকেই হালকা মনে করি। হাসি-ঠাট্টার ছলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কাউকে নিয়ে হাসাহাসি করা বা মন্দ নামে ডাকা যেন আমাদের কাছে তেমন কোনো বিষয়ই না। অথচ এটি এমনই একটি মন্দ কাজ, যে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা এসব থেকে বিরত না হবে তারা ই যালেম। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১১

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী দামাত বারকাতুহুম তাফসীরে তাওযীখুল কুরআনে এ আয়াতের টীকায় বলেন,

“যেসব কারণে সমাজে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, এ আয়াতসমূহে (এ আয়াত এবং এর আগের পরের আয়াত) সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল কাউকে কোনো খারাপ নাম দিয়ে দেওয়া, যা তার জন্য পীড়াদায়ক হয়।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, এরূপ করা গুনাহ আর এটা যে করবে সে নিজে গুনাহগার (ফাসেক) হয়ে যাবে। তার নাম পড়ে যাবে যে, সে একজন ফাসেক (গুনাহগার)। ঈমান আনার পর কোনো মুসলিমের ফাসেক নামে অভিহিত হওয়াটা খুবই খারাপ কথা। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, তুমি তো অন্যকে মন্দ নাম দিচ্ছিলে অথচ নিজেই একটা মন্দ নামে অভিহিত হয়ে গেলো। -তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (বাংলা) খ. ৩ পৃ. ৩৮৮ (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১১-এর টীকা দ্রষ্টব্য)

কাউকে অপমান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এটা মুমিনের স্বভাব হতে পারে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ.

তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই; একে অপরের প্রতি যুলুম করে না, একজন আরেকজনকে লাঞ্ছিত করে না এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৪

হাসি-মশকরার স্বরূপ

হাসি-মশকরা মানুষের একটি স্বভাবজাত বিষয়। মৌলিকভাবে এটি নিষিদ্ধ নয়। বরং ঐ হাসি-মশকরা নিষেধ, যার মাঝে মিথ্যা, অশ্লীলতা ও কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিষয় থাকে। নবীজীও সাহাবীগণের সাথে হাসি-মশকরা করতেন। কিন্তু তাতে মিথ্যাও থাকতো না, কাউকে কষ্ট দেওয়া বা অপমান করার বিষয় থাকতো না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম একবার (কোনো এক প্রযক্ষে) বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনিও আমাদের সাথে হাসি-মশকরা করেন! তখন নবীজী বললেন, (হাঁ, আমি হাসি-মশকরা করি তবে)

لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

তবে আমি সত্য ছাড়া বলি না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৯০

গালি দেওয়া ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা

মুমিন অল্লীল কথাও বলে না, গালিও দেয় না। এ স্বভাব মুমিনের সাথে যায় না। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا بِالْفَاحِشِ، وَلَا بِالْبَذِيءِ.

মুমিন (অন্যের) দোষ চর্চাকারী হয় না, লানতকারী, অল্লীল ও গালিগালাজকারী হয় না (বাজে কথা বলে না)। -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯৭৭

আর কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া তো অনেক বড় অন্যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

মুসলিমকে গালি দেওয়া ফিস্ক (গুনাহের কাজ)। আর তাকে হত্যা করা কুফর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৪

আর যে গালিগালাজ করে তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার সাথে মিশতে চায় না, দূরে দূরে থাকে। তার সাথে মিশতেও সবাইকে বারণ করা হয়। আল্লাহও তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। এক হাদীসে নবীজী বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ, অল্লীল ও গালিগালাজকারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট থাকেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২০০২; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৯৩

রাগের সময় গালাগালি করা মুনাফিকের স্বভাব

একসাথে চলতে গিয়ে মতের অমিল হতেই পারে। বাক-বিতণ্ডা হতেই পারে। কিন্তু এ সকল সময়ে গালিগালাজ করা- এটা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়। অন্যজান গালি দিলেও মুমিন গালি দিবে না। নবীজী বলেছেন, এটা মুনাফিকের স্বভাব। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

.চারটি (মন্দ) স্বভাব আছে, এগুলো যার মাঝে থাকবে সে খালেছ মুনাফিক বলে গণ্য হবে। আর যার মাঝে এই চার স্বভাবের কোনো একটি থাকল, তার মাঝে মুনাফেকির একটি স্বভাব থাকল; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। ১. আমানত রাখলে খেয়ানত করে। ২. কথা বলে তো মিথ্যা বলে। ৩. প্রতুষ্ণতি দিলে ভঙ্গ করে। ৪. তর্কের সময় গালাগালি করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪

রাগের সময়ও যেন আমার মুখ থেকে নোংরা কথা বের না হয়, গালাগালি না করি; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে বাঁচার পথ বাতলে দিয়েছেন- إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. কেউ যখন রেগে যায় সে যেন চুপ হয়ে যায়। (যাতে গালিগালাজ, মন্দ কথা থেকে বাঁচতে পারে।) -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৩৬

উপরে টিল ছুড়লে নিজের মাথায় পড়ে

কোনো ব্যক্তিকে গালি দেওয়া বা ফাসেক কাফের বলা অন্যায়। কোনো ব্যক্তির মাঝে যদি ঐ দোষ থাকে তবুও তাকে ওই কথা বলে গালি দেওয়া নিষেধ। আর যদি না থাকে তাহলে ঐ গালি ফিরে এসে নিজের গায়ে পড়ে। নবীজী আমাদেরকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন-

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.

কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ফাসেক বা কাফের বলে (গালি দেয়), আর তার মাঝে ফিস্ক বা কুফ্র না থাকে। তাহলে ঐ কথা গালিদাতা ব্যক্তির দিকে ফিরে আসে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৪৫

ব্যক্তি কি নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়?

নিজের মা-বাবাকে কি কেউ গালি দেয়? উত্তর হবে, কক্ষনো না। কিন্তু বাস্তবতা হল মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের মা-বাবাকে গালি দেয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আমাদের বুঝিয়েছেন; নবীজী একবার বললেন-

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ.

সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ হল, ব্যক্তি তার মা-বাবাকে গালি দেওয়া।

একথা শুনো সাহাবীগণ বললেন,

وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟

নিজের মা-বাবাকে আবার মানুষ গালি দেয় কীভাবে?

উত্তরে নবীজী বললেন,

يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

ব্যক্তি কারো বাবা (মা)-কে গালি দেয়, তখন সে গালিদাতার বাবা-মা'কে গালি দেয়। (কেমন যেন পরিণামে গালিদাতা ব্যক্তি নিজের বাবা-মা'কে গালি দিল।) -
সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৭৩

যবানের আরো বড় বড় গুনাহ

যবানের দ্বারা মানুষ অনেক বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হয়। যবান আমলের খাতাকে কলুষিত করে। কিয়ামতের দিন এই যবানই মানুষের মহা বিপদের কারণ হবে। যবানের দ্বারা সংঘটিত কিছু পাপ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আল্লাহ আমাদের যবানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

১. গীবত

যবানের দ্বারা সংঘটিত গুনাহের মধ্যে গীবতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি লিপ্ত হয়। কম মানুষই এ থেকে বাঁচতে পারে। এ ব্যাপারে অবহেলার অন্ত নেই। জেনে না জেনে, বুঝে না বুঝে গীবত করতে থাকে। সকালে গীবত করে, বিকালে গীবত করে, রাতে গীবত করে; গীবতই যেন কারো কারো সারাদিনের একমাত্র কাজ। ক'জন একত্র হলে প্রথম কাজ যেন গীবত।

এটা মানুষের সমাজে শত ফ্যাসাদের কারণ। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এর নিকৃষ্টতা ব্যক্ত করেছেন- নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণের সাথে তুলনার মাধ্যমে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোসত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। -সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১২

গীবত সম্বন্ধে আরো বহু বর্ণনা রয়েছে। গীবত থেকে বাঁচার জন্য আজ শুধু এতটুকু জেনে নিই- গীবত ও পরনিন্দার শাস্তি কত কঠিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَزْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِّنْ نُّحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ النَّاسِ، وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ.

মে'রাজের সময় আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যাদের ছিল আমার নখ। সেই নখ দিয়ে তারা নিজেদের চেহার এবং বুকের ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, জিবরীল! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা (দুনিয়াতে) মানুষের গোসত খেত (গীবত করত) এবং মানুষের সম্মান হানি করত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৩৪০

২. পরনিন্দা

সামাজিক ফাসাদের ক্ষেত্রে পরনিন্দা আরো মারাত্মক। পরনিন্দা বলা হয় : বিশ্ব্জ্বলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের দোষ অন্যের কানে লাগানো। পরনিন্দাকারী অন্যকে লাঞ্ছিত

করতে গিয়ে একসময় নিজে লাঞ্ছিত হয়; যখন মানুষ তার আসল উদ্দেশ্য জেনে যায়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ স্বভাবের নিন্দা করে বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ.

দুর্ভোগ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির, যে পেছনে ও সামনে মানুষের নিন্দা করে। -সূরা হুমাযাহ, (১০৪) : ১

আর পরনিন্দাকারীর পরিণাম বড় ভয়াবহ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৫; শুআবুল ইমান, বায়হাকী, হাদীস ১০৫৯০

৩. মিথ্যা

মিথ্যা সকল পাপের মূল। মুনাফিকের স্বভাব। মুমিন মিথ্যা বলতে পারে না। যে এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে, সে মিথ্যা বলতে পারে না। কবীরা গুনাহের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মিথ্যা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীগণকে বললেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহসমূহের কথা বলে দিব? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন আল্লাহর রাসূল! তখন নবীজী বললেন,

الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَبِّئًا فَقَالَ- أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

আল্লাহর সাথে শ্রিক করা। মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া। (এতটুকু বলা পর্যন্ত নবীজী হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন) এরপর নবীজী হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, বললেন, আরে ভালো করে শুনে রাখ! (বড় কবীরা গুনাহের অন্যতম হল,) মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলা। নবীজী অতি গুরুত্বের সাথে এ বাক্য বারবার বলতে লাগলেন। এ দেখে আমরা (মনে মনে) বলে উঠলাম, (নবীজীর তো কষ্ট হচ্ছে!) নবীজী যদি একটু চুপ করতেন! -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৫৪

মিথ্যার পরিণাম জাহান্নাম

মিথ্যার পরিণাম জাহান্নাম। দুনিয়ার পরিণাম হলো লাঞ্ছনা। কারণ, মিথ্যা গোপন থাকে না; কোনো না কোনোদিন প্রকাশ পেয়েই যায়। একটি মিথ্যা দশটি মিথ্যা টেনে আনে, পাপের বোঝা বাড়াতেই থাকে। একপর্যায়ে মিথ্যার জাল থেকে বের হওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সাময়িক ও বাহ্যিক ক্ষতি বা শাস্তি মেনে নিয়ে হলেও মিথ্যা থেকে একশ হাত দূরে! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَأَيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكُتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় মিথ্যা পাপের পথে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নামে নিয়ে ফেলে। ব্যক্তি মিথ্যা বলতেই থাকে, মিথ্যার খোঁজে থাকে; এক পর্যায়ে আল্লাহর খাতায় ‘কায্যাব’ (মহা মিথ্যাবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। - সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬০৭

৪. মিথ্যা সাক্ষ্য

মুমিন কখনোই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে না। মুমিনের এই গুণের কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ.

যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় না। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৭২

উপরে ‘মিথ্যা’ শিরোনামে উল্লেখিত হাদীসটিরই একটি বর্ণনার মধ্যে মিথ্যার সাথে মিথ্যা সাক্ষীর কথাও উল্লেখ হয়েছে। সে হাদীসের পাঠ হল-

أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

(তোমরা শুনে রাখ! বড় কবীরা গুনাহের অন্যতম হল,) মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষী...! -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৭৬

৫. মিথ্যা কসম

কসম করা হয় কাউকে কোনো কথা বিশ্বাস করানোর জন্য। কথার তাকিদ করার জন্য। নিজের কথা বা কাজের সুসত্যতা প্রমাণের জন্য। অথবা প্রমাণবিহীন বিষয়ে কসমকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার জন্য। এখন যার মাধ্যমে সত্য সুপ্রমাণিত করা হয়, সেটির ভিত্তি যদি হয় মিথ্যার উপর তখন এটি কত মারাত্মক অন্যায় বলে গণ্য হয়! তাছাড়া কসম হয় আল্লাহর নামে। মিথ্যা, আবার আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা!- ‘চুরি আবার সিনাজুরি’!! এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্যায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা অতি কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্ফদ শাস্তি। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৭৭

মিথ্যা কসম যেখানে আল্লাহর কাছে এত বড় অন্যায়, সেখানে কীভাবে আমরা গুরুত্বহীনভাবে কোনো কোনো সময় মিথ্যা কসম করে ফেলি?

অনেক সময়ই এমন হয়- এক বন্ধু আরেক বন্ধুর সাথে কথা বলছে তো সামান্য একটি অপ্রয়োজনীয় কথা বিশ্বাস করানোর জন্য মিথ্যা কসম করে ফেলে। তেমনি তুচ্ছ কোনো বস্তু নিজের প্রমাণ করার জন্য বা অন্যের নয়- এ কথা প্রমাণ করার জন্য আমরা জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম করে ফেলি। অথচ এটা কত বড় অন্যায় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرْأِكَ.

কেউ যদি (মিথ্যা) কসমের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের হক কেটে দেয় (মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কাউকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে।) আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। এ কথা শুনে এক সাহাবী

বললেন, যদি সামান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে? নবীজী বললেন, হাঁ, যদি আরাকের (এক প্রকার গাছ) সামান্য একটি ডালও হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৭

যবানের অনিষ্ট হতে বাঁচতে হলে

আমার সব কথা লিপিবদ্ধ হচ্ছে, আমাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে- এ কথা অন্তরে যত সতেজ রাখব তত যবানের অনিষ্ট হতে বাঁচতে পরব। সাথে সাথে মনে রাখি :

আমি মুসলিম, আর প্রকৃত মুসলিম সেই...

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অপরাপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০

সদা সত্য বলব, সত্যের ঠিকানা জাম্মাত

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا.

সদা সত্য বল, কেননা সত্য ভালো কাজের পথে পরিচালিত করে। আর ভালো কাজ জাম্মাতে নিয়ে যায়। ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে এবং সত্যবাদীতার চেষ্টায় থাকে একপর্যায়ে আল্লাহর খাতায় ‘ছিদ্দীক’ (চির সত্যবাদী) নামে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। - সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬০৭

অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকব

মুমিনের গুণই হল-

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.

যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। -সূরা মুমিনুন (২৩) : ৩

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ.

ব্যক্তি ভালো মুসলিম হওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল, অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৭

আল্লাহ্‌ অসম্ভব হন এমন কথা বলব না

নবীজীর সন্তান ইবরাহীম ইন্তেকাল করলে নবীজী কাঁদছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনিও...? (আপনিও কাঁদছেন) তখন নবীজী বললেন, হে ইবনে আউফ!...

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا

চোখ থেকে অশ্রু ঝরবেই, হৃদয় ব্যথিত হবেই। কিন্তু আল্লাহ্‌ অসম্ভব হন এমন কথা আমরা বলব না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩০৩

জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখি

এক সাহাবী নবীজীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَعْيُنِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَسَبَّبُ بِهِ،

ইসলামের বিধান তো অনেক; আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমি গুরুত্ব সহকারে পালন করব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

তোমার যবান যেন সদা আল্লাহর যিকির দ্বারা সতেজ থাকে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭৫

ভালো কথা বলব অথবা চুপ থাকব

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُومْ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৭

আল্লাহ আমাদের যবানের যাবতীয় অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন। এ নিআমতকে ভালো কাজে ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দিন। আমীন v

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৪২>

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা (Self_Reminder)

ABU SALAMAH

Senior Member

০৮-২৫-২০১৬

জনৈক আলেম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে.....

কোন একজন ছাত্র দীর্ঘ দিন তার উস্তাদের কাছে ইলম অর্জন করার পর যখন বিদায় নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছিল তখন উস্তাদ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কত বছর তুমি আমার কাছে অবস্থান করেছ?

ছাত্র বললঃ ৩৩ বছর!!!

উস্তাদ বললেনঃ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছো?

ছাত্র বললঃ আমি আপনার নিকট থেকে মাত্র **ছয়টি** মাসআলা শিখেছি।

উস্তাদ বললেনঃ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ছয়টি মাসআলা শিখেছো? ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন। আমি মনে করি তোমার মধ্যে আল্লাহর ভয় বলতে কিছু নেই?

ছাত্র বললঃ আমি সত্য বলছি, মিথ্যা নয়।

উস্তাদ এবার বললেনঃ আচ্ছা বলো তো কী সেই মাসআলা ছয়টি?

এবার ছাত্র বলতে লাগলঃ

১. আমি দেখলাম দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শুধু হিংসা আর হিংসা। একজন আরেকজনের সাথে হিংসা করে। কেউ কাউকে ভালবাসেনা। আর আমি যখন আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলামঃ

“আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য সম্পূর্ণরূপে বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবো (সূরা হিজরঃ ৪৭)

তখন দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী বর্জন করে আমি জান্নাত যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলাম।
উস্তাদ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চাও?
হাত্র বললঃ আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করেছি,

“আর যারা তাদের প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় পায় তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে দু’টি করে জান্নাত।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

“আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত হলো এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রাখলো তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

সুতরাং আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই সাথে জান্নাতের আশা নিয়ে আল্লাহর ভয়েই আমি আমল করি। আর আমি আমার নফস থেকে খারাপ চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি বের করে ফেলেছি এবং নফসকে একদম সোজা করে ফেলেছি।

২. আমি দেখলামঃ দুনিয়ার প্রত্যেকেই একজন করে খাস বন্ধু গ্রহণ করে। আমিও একজন বন্ধু খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম সেই বন্ধুও এক সময় আলাদা হয়ে যাবো। কারণ মৃত্যুর সময় কারো বন্ধুই সাথে যায়না। একমাত্র তার আমলই সাথে যায়। তাই আমি দুনিয়ার কোন মানুষকে বন্ধু না বানিয়ে শুধু আখেরাতের আমলকেই বন্ধু বানালাম। উস্তাদ বললেনঃ তুমি খুব ভাল করেছ।

৩. আমি দুনিয়ার মানুষের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, তাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু জিনিস আছে, যা সে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু আমি দেখলামঃ সেই লুকায়িত জিনিসটিও কখনো দুনিয়ার চুর-ডাকাতেরা নিয়ে চলে যায়। তাই আমি যখন দেখলামঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য আমল করে, সেই আমল কখনো নষ্ট হয়না, কোন চুর-ডাকাত তা চুরি করতে পারেনা। আল্লাহ তাআলা তার বিনিময় পুরাপুরি দান করেন। তাই আল্লাহর জন্য আমল করাকেই সর্বাধিক প্রিয় মনে করলাম।

৪. আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা রিষিকের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করছে এবং পরস্পর হিংসা করছে। আর আমি যখন আল্লাহর এই বাণী পেলামঃ

“তারা কি তোমার রবের রহমত (রিষিক) বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বণ্টন করে দিয়েছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি”। (সূরা যখরুফঃ ৩২)

তখন থেকে রিষিকের জন্য বেশী হাছতাশ করা এবং টেনশন করা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছি।

৫. আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা পরস্পরকে শত্রু মনে করে এবং তাদের কেউ অন্য কাউকে দেখতে পারেনা এবং যখন আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলামঃ

আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু ই মনে করো। সে তো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়”। (সূরা ফাতিরঃ ৬)

আল্লাহর এই বাণী উপলব্ধি করার পর আমি মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বাদ দিয়ে কেবল শয়তানকেই আমার একমাত্র শত্রু মনে করলাম।

৬. আমি দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা টাকা-পয়সা, গাড়ি-ঘোড়া, দুনিয়ার মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং দুনিয়ার বিপদাপদকে ভয় করে। আর আমি যখন দেখলাম এগুলো চিরস্থায়ী নয় এবং যখন দেখলাম

“যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন পন্থায় তাকে রিষিক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর কাজ সমপূর্ণ করে থাকেন”। (সূরা তালাকঃ ২)

তখন আমি দুনিয়ার সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করতে লাগলাম।

তখন উস্তাদ বললেনঃ তুমি অত্যন্ত উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছ।

আল্লাহই ভাল জানেন।

(collected)

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৬৭>

একটি শিক্ষণীয় বাসরগল্প :

hadid_bd

Senior Member

১১-১০-২০১৬

বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী যুগল প্রথম রাতে একত্রিত হয়, এটাকেই বাসর রাত বলে। মানবজীবনের এক কাক্সিক্ষিত ও স্মরণীয় মধুময় রজনী এটি। রাত বাড়ার সাথে সাথে দু'জনের হৃদকম্পন ও স্নায়ুচাপ বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে। সুনসান ও পিনপতন নিরবতা ভেঙে দু'জনে অনাগত ভবিষ্যতের গল্পে মেতে ওঠে। কিন্তু এ আনন্দঘন মুহূর্তে এবং সুখ-সাগরে সাঁতরানোর পূর্বক্ষণেও অনেকে জৈবিক ও মানবীয় লোভ-লালসার উর্ধ্বে ওঠে নিজের ঈমানি চেতনা এবং ধর্মীয়বোধ ও বিশ্বাসকে সম্মুখ করে তোলেন। এমনই একজন মহামানবের বাসর রাতের গল্প দিয়ে সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধের ইতি টানব।

উপমহাদেশ স্বাধীকার আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা, ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রভূমি দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাও. কাসেম নানুতবি রহ. দেওবন্দ শহরে বিয়ে করেন। মিরাঁঠের একটি কুতুবখানায় সম্পাদনার কাজ করতেন তিনি। কর্মক্ষেত্র মিরাঁঠে জীবনের বড় একটি অংশ কাটালেও স্বশুরবাড়ি দেওবন্দ আসা-যাওয়া ছিল নিয়মিত। এ সূত্রধরেই দেওবন্দের মাটির সাথে তাঁর পরিচয় এবং দেওবন্দ নামক ছোট্ট শহরেই প্রজ্জ্বলিত করেন ঈমানের মশাল। যা তাকে পরবর্তীতে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছে এবং কিংবদন্তির মর্যাদা এনে দিয়েছে। সে যাক, এবার আমরা হযরতের মুহূর্তারামা জীবনসঙ্গিনীর জবানিতে বাসর রাতের গল্প শুনব। তিনি বলেন :

“আমার পিতা শায়খ কারামত হাসান সাহেব দেওবন্দের সর্দার ও নেতা ছিলেন। আমাকে হযরতের সাথে বিয়ে দিয়ে বিদায় জানানোর প্রাক্কালে সেসময়ের তুলনায় অনেক মালামাল, জিনিসপত্র ও উপহারসামগ্রী দিলেন। দামি গহনা ও অলংকার, মূল্যবান কাপড়চোপড় ও তামানির্মিত হাড়ি-পাতিলসহ আরো অনেক আজ্ঞাপাতি ছিল। ফুলশয্যার রাতে হযরত বাসরঘরে প্রবেশ করে নফল নামায পড়লেন। নামায

পড়াশেষে আমার কাছে এসে অত্যন্ত ভদ্রতা, নম্রতা, গান্ধীর্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, দেখ! আল্লাহ তাআলা যেহেতু আমাদেরকে একসাথে করে দিয়েছেন তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমতাবিধান অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, তুমি ধনী ও বিত্তশালী; আর আমি গরিব ও সম্পদহীন। এখন পদ্ধতি দু'টিই, হয়তো আমিও তোমার ন্যায় ধনী হয়ে যাব কিংবা তুমি আমার মতো গরিব হয়ে যাবে। আর আমার ধনী হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ ও সুদূরপর্যায়। এজন্য সহজ পদ্ধতি দ্বিতীয়টি-ই যে, তুমি আমার মতো গরিব হয়ে যাবে। এ ধরনের আরো কথাবার্তা বললেন। অবশেষে বললেন, তোমাকে যদি এমন কাজের নির্দেশ দিইঁ যাতে তোমারই উপকার রয়েছে, তা কি তুমি পালন করবে? এ ব্যাপারে কি আমার ওপর তোমার আস্থা ও ভরসা রয়েছে? আমি বললাম, আপনার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ও শতভাগ ভরসা রয়েছে। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আমাকে বললেন, আচ্ছা! তবে তোমার গহনা খুলে আমাকে দিয়ে দাও; আর তোমার সমস্ত মালামালের ব্যাপারে আমাকে অধিকার দিয়ে দাওঁ আমি যা ইচ্ছে তাই করব। আমি কোনো চিন্তা-ভাবনা ও সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত বললাম, এ ব্যাপারে আপনার পূর্ণ অধিকার আছে; আমি আপনাকে আমার সমুদয় মালামালের মালিক বানিয়ে দিলাম। সকাল বেলা তিনি হাজার হাজার টাকার সমস্ত গহনা, কাপড়চোপড় ও মালামাল সুলতানি চান্দায় দান করে দিলেন (সেসময় তুরস্কের ইসলামি খেলাফতের জন্য হিন্দুস্তানে কালেকশন করা হচ্ছিল)।

এর কিছুদিন পর আমি প্রথম দেওবন্দ আসলাম। আমার হাত-পা ও কান খালি দেখে আমার পিতা জিজ্ঞেস করলেন, গহনা কোথায়? আমি পুরো ঘটনা আব্বাকে বলে দিলাম। শায়খ কারামত হাসান সাহেব মুখ দিয়ে কিছু বললেন না। তবে ভাবলেন, আমার মেয়ে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীর সামনে খালি হাত-পায়ে থাকবে, এটা কেমন দেখা যায়। তাই তিনি বাজারে গিয়ে আবার নতুনকরে অলংকার বানিয়ে আনলেন। এ নতুন অলংকার ও গহনাঘাটিসহ স্বশ্রববাড়ি ফিরলাম। রাতের বেলায় হযরত ঘরে তাশরিফ আনলেন। আমার সাথে দুনিয়াবিমুখতা ও আত্মরাতের আলোচনা শুরু করলেন এবং একপর্যায়ে আমার অলংকার নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, এ অধিকার তো আপনাকে আমি বাসর রাতেই দিয়েছিলাম, তা ফেরত নেওয়ার তো কোনো প্রশ্নই

ওঠে না; যা দিয়েছি তা আর কোনোদিন ফেরত নিব না। সকালবেলা তিনি সব অলংকার পূর্বের মতো সুলতানি চাঁদায় দিয়ে দেন।

হযরতের স্ত্রী প্রায় বলতেন, এ ঘটনার পর আমার অন্তর থেকে অর্থকড়ি ও গহনাঘাটির ভালোবাসা এবং চাহিদা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। এসবের প্রতি একধরনের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অতঃপর পুরো জীবন কাটিয়ে দিলাম কিন্তু আর কোনো অলংকার পরিনি, দামি কাপড় গায়ে জড়াইনি। এমনকি এগুলো নেওয়ার কোনো খাহেশ ও ইচ্ছাও পয়দা হয়নি।”

প্রিয় পাঠক! স্বামীর আদেশের সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার এমন নায্যারা এবং কুরবানির এমন নজ্ঞানা কোথায় পাওয়া যায়, বলুন? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মহিয়সী এ নারীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় মাও. আহমদ রহ., আর মাও. আহমদের ঔরসেই জন্ম নেয় দারুল উলুমের দ্বিতীয় রূপকার, দেওবন্দি মাসলাকের মুখপাত্র, কাসেমো সানি, হাকিমুল ইসলাম হযরত মাও. কারি মুহাম্মদ তৈয়্যব সাহেব রহ.। যিনি দীর্ঘ ষাট বছর দারুল উলুমের মুহতামিম ছিলেন এবং এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন; যার সামনে জামিআ আযহারের খ্যাতি ল্হান হয়ে যায়।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৪৮৭>

দৃষ্টি সংযত করার ২০ টি উপায়

HeartTouching

Member

০৭-১৪-২০১৬

আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক মুসলিমের তার দৃষ্টিকে সংযত রাখা একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। প্রতিটি বিশ্বাসী মুসলমানের উচিত নিজের দৃষ্টির সংরক্ষণের জন্য ও নিজের এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেওয়া ও এ বিষয়ে কোন রকম ত্রুটি না করা।

দৃষ্টি অবনত রাখার উপায়ের ব্যাপারে প্রখ্যাত আলেম শেইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনায্জিদ বলেনঃ

ইসলামী শরিয়ত এমন সমস্ত পথকে নিষিদ্ধ করে যা মানুষকে অনৈতিকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে; তার মধ্যে একটি হল গায়ের মাহরাম বা বেগানা নারীর দিকে তাকানো। মাহরাম হল বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ এমন আত্মীয়, যেমন পুরুষদের জন্য মা, বোন, মেয়ে, আপন খালা, ফুফু, শাশুড়ি ইত্যাদি; নারীদের জন্য বাবা, ভাই, ছেলে, আপন চাচা, মামা, স্বশুর ইত্যাদি। সুতরাং গায়ের মাহরাম হল এমন সমস্ত মানুষ যারা মাহরাম নন। মহান আল্লাহ বলেন-

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে (নিষিদ্ধ জিনিস দেখা হতে) এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।” [সূরা নূরঃ৩০]

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাসীর বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলার নির্দেশ হল যেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম করা হয়েছে বান্দা যেন সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। হারাম জিনিস হতে চক্ষু নিচু করে নেয়। যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়েই যায় তবে দ্বিতীয়বার যেন দৃষ্টি না ফেলে।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ ‘সাথে সাথেই দৃষ্টি সরিয়ে নেবো’ (মুসলিম ৫৩৭২)।

দৃষ্টি নিম্নমুখী করা, এদিক ওদিক দেখতে শুরু না করা, আল্লাহর হারামকৃত জিনিসগুলোকে না দেখা এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন- ‘হে আলী! দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমার, কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য ক্ষমার যোগ্য নয়।’ (আবু দাউদঃ ২১৪৪)

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হঠাৎ দৃষ্টি’ বলতে বোঝায় যখন কোন ব্যক্তির চোখ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন বেগানা নারীর উপর পড়ে যায়। এভাবে হঠাৎ করে চোখ পড়ে যাওয়াতে কোন গুনাহ নেই, তবে সাথে সাথে তার দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি সে এর পরও দেখা বন্ধ না করে, তাহলে সে এই হাদিস মোতাবেক গুনাহগার হয়ে যাবে।

পুরুষরা তাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে, সব অবস্থায় নিষিদ্ধ জিনিস দেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, যদি না একান্তই কোন বৈধ কারণ থাকে, যেমন – কোন সামান্য দেওয়া, চিকিৎসা, বিয়ের প্রস্তাব, আর্থিক লেনদেন এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও ঠিক ততটুকুই দেখা বৈধ ঠিক যতটুকু দরকার, এর বেশী নয়।

দৃষ্টি সংযত রাখার অনেক উপায় আছে। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন।

১। সবসময় মনে রাখা যে আল্লাহ আপনাকে দেখছেন, আপনি যেখানেই যান আল্লাহ আপনার সঙ্গেই আছেন (তাঁর সর্বময় জ্ঞানের মাধ্যমে) হতে পারে আপনি লুকিয়ে আপনার পাশের জনকে দেখছেন যা সে জানে না, কিন্তু আল্লাহ তা জানছেন।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (সূরা গাফিরঃ ১৯)

২) আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, মিনতি সহকারে তাঁকে ডাকা। আল্লাহ বলেন-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। (সূরা গাফিরঃ ৬০)

৩) সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা যা নেয়ামত উপভোগ করছেন তার সবই আল্লাহর তরফ থেকে পেয়েছেন, আর এ জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর দেওয়া দৃষ্টির নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে আপনাকে আপনার চোখ দুটিকে সে সব জিনিস দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে যা যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ভাল কাজের প্রতিফল কি ভাল ছাড়া কিছু হতে পারে?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (সূরা নামলঃ ৫৩)

৪) নিজের সাথে সংগ্রাম করা, দৃষ্টি নত রাখার জন্য নিজে নিজে অভ্যাস করার চেষ্টা করা এবং এ কাজে ধৈর্যশীল হওয়া ও হাল ছেড়ে না দেওয়া। আল্লাহ বলেন-

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (সূরা আনকাবুতঃ ৬৯)

৫) এমন সব স্থান এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যেখানে নিষিদ্ধ দৃষ্টির প্রলোভনে পড়ার আশঙ্কা আছে বলে মনে হয়। যেমন, মার্কেট, বিপনী বিতান, পর্দাহীন দাওয়াতের আসর, রাস্তা ঘাটে অলস আড্ডা, ইন্টারনেটে অহেতুক ঘাঁটাঘাঁটি ইত্যাদি। রসুল (সাঃ) বলেছেন-

তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা আর এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি বললেন, “যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবো রাস্তার হক আদায় করবো।” তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি (সাঃ) বললেন, ‘দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া,

সংকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসংকাজে নিষেধ করা।' (বুখারী ২৩০৩; ইফা)

ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই হাদিসটি প্রযোজ্য। এখানেও নিজের দৃষ্টিকে (নিষিদ্ধ সাইট, অন্যের প্রোফাইল অকারণে দেখার মাধ্যমে) যত্রতত্র নিক্ষেপ করা, কাউকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করা, অর্থহীন আলোচনায় লিপ্ত হওয়া অনুমোদনযোগ্য নয়।

৬) সবসময় এটা মনে রাখা যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক, নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ বা প্রলোভন যতই বড় হোক, আপনার মনের ভেতরে যতই আবেগের তাড়না আসুক, এই ব্যাপারে আপনার আর কোন পথ খোলা নেই। আপনাকে সব জায়গায়, সব সময় নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দৃষ্টি সংযত করতেই হবে। আশেপাশের কলুষিত পরিবেশের অজুহাত দিয়ে বা আপনি প্রলোভনের শিকার হয়েছেন এসব কথা বলে নিজের দোষের সপক্ষে যুক্তি দেখানোর কোন অবকাশ নেই।

৭) বেশী বেশী করে নফল ইবাদত করা, কারণ নিয়মিত ফরজ এবাদতের সাথে সাথে নফল ইবাদত করে নিজের শারীরিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেছেন,

“...আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। আমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয়পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী শোনে) আমিই তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দেখে) আমিই তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হাত দিয়ে কাজ করে) আমিই তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে (অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে) সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাঁকে আশ্রয় দেই।...” [সহীহ বুখারী ৬০৫৮]

৮) এটা মনে রাখা যে আমরা যে জমীনের উপর গুনাহ করি, সেই জমীন আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের গুনাহের সাক্ষী দেবে। আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

সেদিন সে (পৃথিবী) তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (সূরা জিলজালঃ ৪)

৯) যে আয়াত দৃষ্টিকে এদিক সেদিক অযথা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি নিষ্ক্ষেপ করতে নিষেধ করে তা মনে করা। যেমনঃ

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে (নিষিদ্ধ জিনিস দেখা হতে) এবং তাদের যৌনাসঙ্গ হেফযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।” [সূরা নূরঃ ৩০]

১০। অপ্রয়োজনীয় এদিক সেদিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা, শুধুমাত্র যা দেখা প্রয়োজন সেদিকে তাকানো; বিশেষ করে এমন জায়গায় অযথা দৃষ্টি না ফেরানো যেখানে এমন প্রলোভনের আশঙ্কা থাকে যা থেকে সহজে মুক্ত হওয়া কঠিন। হতে পারে সেটা আপনার আশেপাশের দৃশ্য, বা কোন ম্যাগাজিনে, টিভিতে, অথবা ইন্টারনেটে।

১১) বিয়ে হল একটি কার্যকরী প্রতিকার। নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন-

“হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে; এবং যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা পালন করে। কেননা, রোজা তার যৌনতাকে দমন করবে।” (সহীহ বুখারী ৪৬৯৬, ইফা)

১২) বেহেশতের ছরদের কথা মনে করা; আল্লাহ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন তা দেখা হতে নিজেকে বিরত রাখতে উৎসাহিত করবে, যাতে আল্লাহর এই নেয়ামতের পাওয়ার আশা করতে পারেন। রাসুল (সাঃ) বলেছেন-

‘জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে সমস্ত দুনিয়া আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর নাসীফ (ওড়না) দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।’ (সহীহ বুখারী ৬১২১; ইফা)

১৩) যার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করছেন তার ত্রুটি সম্পর্কে চিন্তা করা...

১৪) যত্রতত্র দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপের কুফল, এর শাস্তি ও তার যন্ত্রণার কথা চিন্তা করা।

১৫) দৃষ্টি অবনত রাখার সুফল সম্পর্কে চিন্তা করা।

১৬) মানুষের সঙ্গে আলচনার আসরে, জনসমাবেশে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা, এর কুফল সম্পর্কে ব্যখ্যা করা।

১৭) যেসব পোষাকে, চালাচলনে, কথাবার্তায় সৌন্দর্য প্রদর্শিত হয় ও অন্যকে আকৃষ্ট করে এমন সব কিছু পরিহার করতে নিজের পরিবার ও আত্মীয়দেরকে উপদেশ দেওয়া।

১৮) যেসব কুচিন্তা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা মনে জাগে তা আপনাকে কাবু করে সেই অনুযায়ী কাজে পরিণত করার আগেই সাথে সাথে তা ঝেঁরে ফেলা। যে প্রথম দৃষ্টিতেই নিজেকে সংযত করে নেয় সে অনেক সমস্যা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে; কিন্তু যে নিজেকে এই কাজেই লিপ্ত রাখে সে কখনও দৃঢ়তার সাথে মন থেকে এর কুপ্রভাব দূর করতে পারে না।

১৯) মৃত্যুর সময় নিজের কর্ম নিয়ে গভীর অনুশোচনার কথা জীবন থাকতেই চিন্তা করা ও এই করুন পরিনতির কথা চিন্তা করে ভীত হওয়া।

২০) সংসঙ্গে থাকা। কারন মানুষ যাদের সাথে চলাফেরা করে তাদের বৈশিষ্ট্য দিয়েই প্রভাবিত হয়। আর তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচরের অনুসরণ করে; এবং সবচেয়ে কাছের বন্ধুই মানুষকে তার নিজের পথে টেনে নেয়। আপনি যদি এমন বন্ধুদের সঙ্গে থাকেন যাদের দৈনন্দিন অভ্যাসই হল অন্য নারীদের নিয়ে আলোচনা করা, হারাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, তাহলে নিশ্চিত ভাবেই আপনার জন্য দৃষ্টি সংযত রাখা দুর্কর। অন্যদিকে আপনি যদি এমন মানুষের সঙ্গে থাকেন যিনি এই বিষয়ে সদা সতর্ক, স্বাভাবিকভাবেই তখন আপনি ইচ্ছা থাকেলও এই হারাম কাজ প্রকাশ্যে করতে সংকোচ বোধ করবেন। অতএব সঙ্গ নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, নিজের স্বার্থেই।

পোস্ট লিংক: <https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৫৯৪>